সংবাদ

15 NOV 2008

শুধু মাধ্যমিক নয়, মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমও পরিবর্তন করতে হবে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও উন্নয়নের কথা থাকলেও দীর্ঘ ১২ বছর পর মাধ্যমিক পর্যায়ে এ কাজটি শুরু করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান। প্রায় ৫০ জনের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ একটি দল এ স্তরের বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলোর কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে ইত্যাদি বিষয় এ পর্যায়ে খুঁজে বের করছেন তারা। এ কাজগুলো শেষ করতে নাকি আরও দেড় মাস লাগতে পারে।

এনসিটিবি'র সূত্র বলছে, একটি কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশে প্রথম নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। এর এক দশক পর ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম এবং ১৯৯৭ সালে সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা হয়। সেই পাঠ্যপুস্তকগুলোই বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে ২০০০ সালে উচ্চপর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই পাঠ্যপুস্তকগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জন করে। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন বা উন্নয়নের কাজ কত বছর পরপর করা হবে; তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও সাধারণত ১০ বছর পরপর করা উচিত বলে মনে করা হয়। এবার কাজটা করা হচ্ছে ১২ বছর পর।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনাটাও জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে পাস করা ছাত্রদের ভর্তি নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকটি বিভাগে মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের ব্যাপারে প্রধান আপত্তি তাদের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বর করে থাকে। অথচ উচ্চ মাধ্যমিকে এ দুটি বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। এটা মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের একটা ঘাটতি। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিলেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা ছাত্ররা বেশি জানবে তা হয়তো নয়; কিন্তু এ দুটি বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপের আর কোন বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠি নেই।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যাতে স্বচ্ছন্দে 'সাধারণ' শিক্ষাক্রমে ভর্তি হতে পারে সেজন্য দাখিল ও আলিম পাঠ্যক্রম সংশোধন করে ২০০ নম্বরের পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এর জন্য শুধু সিলেবাস বদলালে হবে না, শিক্ষাদানকেও যুগোপযোগী করতে হবে। কয়েকদিন আগে প্রকাশিত এক জরিপ থেকে দেখা গেছে, মাদ্রাসাগুলোয় এ দুটি বিষয় এবং গণিতের শিক্ষাদানের মান উন্নত করতে হবে। ইংরেজি ও বাংলায় ১০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য শিক্ষাদানের মান যদি যথাযথ না হয় তবে ২০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে মাদ্রাসাগুলোতে বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণত দাখিল ও আলিমকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দুটি 'সমমানের' বলে উল্লেখ করা হয়। সত্যিকার অর্থে যদি সমমানের করতে হয় তবে 'থ্রি-আর' বা পড়া, লেখা ও গণিতে সমমানের হতে হবে। গণিতের প্রশ্নটি আসে কেননা হিউমানাইটসের কোন কোন বিষয়ে (যেমন– অর্থনীতি) ভর্তি হতে হলে এইচএসসিতে গণিত থাকতে হয়। ফলে বিজ্ঞান নিয়ে যারা এইচএসসি পাস করে তারা গণিত থাকলে অর্থনীতির বিষয়ে ভর্তি হতে পারে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা যদি এইচএসসির সমমানের ইংরেজি, বাংলা ও গণিত বিষয়ে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় তবে বিজ্ঞান ছাড়া সব বিষয়েই ভর্তি যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যদি মাদ্রাসা বোর্ড ওই তিনটি বিষয়ের পাঠক্রম নিয়ে পর্যালোচনা করতে না চায়, তবে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসির ইংরেজি, বাংলা ও গণিতের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে পারে এবং একই সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণ শিক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে এটাই সহজ পন্থা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তা হলে বর্তমানে তাদের নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হবে।